মানববিদ্যা গবেষণাপত্র পঞ্চম সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪২৯ ॥ জুলাই ২০২২ ॥ ISSN 2518-5853
কলা অনুষদ ॥ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

ফররুখ আহমদের *পাখির বাসা*: বিষয় ও শিল্পভাবনা

মো. আব্দুর রহমান*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) চল্লিশের দশকের এক স্বতন্ত্র ধারার কবি। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রভাবজাত ইসলামি ঐতিহ্য এবং ইসলামি পুনর্জাগরণের অন্যতম রূপকার। কবিতাচর্চার পাশাপাশি দীর্ঘসময় ধরে শিশুদের জন্য ছড়া রচনা করেছেন। বিভাগোত্তর বাংলাদেশের ছড়া সাহিত্যে যে কয়েকজন প্রতিভাবান শিল্পীর সন্ধান মেলে তার মধ্যে ফররুখ আহমদ অনন্য। সমকালীন অস্থির সময়ে যে কয়েকটি ছড়াকাব্য বিষয় ও শিল্পের দিক দিয়ে অভিনবত্বের সাক্ষ্য বহন করে তার মধ্যে ফররুখ আহমদের *পাখির বাসা* অন্যতম। সহজাত হাস্যরস ও ব্যঙ্গবিদ্রুপ এখানে কম উপস্থিত হলেও ছড়ার আঙ্গিকগত নানারকম নিরীক্ষার পাশাপাশি শিশুর মনোজাগতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক বয়ান, ইসলামি ঐতিহ্য এবং এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিপুণ সমাহার ঘটেছে এ কাব্যে।

ভারতবর্ষের বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিভাজনের রাজনীতি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাংলায় বঙ্গভঙ্গের পর থেকেই মুসলমানরা রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠনের মধ্য দিয়ে। এ সময় মুসলমানদের চেতনাগত বিশ্বাসে এক ধরনের জাতিগত ঐক্যের চিন্তা প্রবল হয়ে ওঠে। এরপর থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে একের পর এক প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম নেতাদের উত্থান ঘটে। গ্রামীণ নিরক্ষর জনগোষ্ঠী পর্যন্ত রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠে। এই ঢেউ ক্রমশ প্রবল হয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিভাজনের দেয়াল প্রশস্ত করতে থাকে। তারই ফলে ভারতভূখণ্ডে মুসলমানেরা নিজেদের স্বতন্ত্র ভূমির দাবি তোলেন। শুরু হয় তীব্র পাকিস্তান আন্দোলন। ঘরে ঘরে সেদিন

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ।

মুসলমানদের স্লোগান হয়ে ওঠে, "কান মে বিড়ি, মুহ মে পান/ লেড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।" এরপর ইতিহাসের ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভারতভূমি ভাগ হয়ে যায় পৃথক দুটি রাষ্ট্রে।

এই বিভাজনের অস্থি-কঙ্কালে মিশে ছিল কলকাতা রায়টের রক্তের দাগ, গৃহহারা অগণন মানুষের কান্না আর এর বাইরে মুসলমানদের নতুন রাষ্ট্র পুনর্গঠনের চিন্তা। সাতচল্লিশের পূর্বে পাকিস্তান আন্দোলন যতখানি সক্রিয় ছিল; বিভাজনের পর পাকিস্তানের রাজনীতিতে এ আন্দোলনের প্রভাব আরো প্রবল হতে থাকে। এসময় এদেশের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমন কি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সর্বত্রই লক্ষ করা যায়।

১৯৪৭ সালের বিভাজনের পর বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যে আমূল পরিবর্তন আসে। পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠী কলকাতা থেকে চলে এসে ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্য সাধনায় ব্রত হন। নতুন রাষ্ট্রে নানামুখি সংকটের মধ্য দিয়েও সাহিত্যে নতুন মাত্রা এসেছিল। বিশেষ করে কলকাতার হিন্দু আদর্শ থেকে সরে এসে নতুন রাষ্ট্রের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হয় সাহিত্যিকদের। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রভাবে ওপারের প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্যিকরা এপারে এসে কেউ আর আগের ধারায় সাহিত্যচর্চা করলেন না। এ সময়ের সাহিত্যিকদের মাঝে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অনেক বড় হয়ে উঠেছিল। ফলে বিভাগোত্তর সময়ে শিল্পের চেয়ে রাষ্ট্রের অনুকূলের চিন্তাগুলো সাহিত্য আসরে বেশি উঠে আসে।

খিলাফত আন্দোলনের পর থেকেই বাংলা সাহিত্যে ফররুখ আহমদের মধ্যে মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন প্রবল হয়ে ওঠে। যার কারণে তিনি মনে করেছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্র সমগ্র মুসলিম জাহানকে পুনর্বার সমৃদ্ধির জায়গাতে নিয়ে দাঁড় করাবেন। আর তাই পাকিস্তান আন্দোলনের সেই আদর্শকে সামনে রেখেই তিনি শিশুতোষ ছড়াচর্চায় ব্রত হন। তিনি চেয়েছিলেন সাম্যে, ভ্রাতৃত্বে, আদর্শে এ রাষ্ট্র প্রকৃতই মুসলিম রাষ্ট্র হয়ে উঠুক। এ রাষ্ট্রে দেশাত্মবোধ, ইসলামি চেতনা, নব উদ্দীপনা ও আত্মোপলব্ধি নিয়ে প্রকৃতির আলো-বাতাসের মাঝে বড় হয়ে উঠুক আগামীর প্রজন্ম। আর সেই চিন্তাই বিকাশ লাভ করেছে তাঁর *পাখির বাসা* ছড়াকাব্যের মধ্যে:

> সমসাময়িক অন্যদের চাইতে ছড়া অনেক বেশি লিখেছেন ফররুখ আহমদ। চল্লিশের প্রতিভাধর এই কবি-ব্যক্তিত্ব শিশুদের সহজ-সরল মনটির সন্ধান পেয়েছিলেন, হয়তো এ কারণেই তাঁর বিষয়ভিত্তিক ছড়াগুলোর ভেতর দিয়ে উন্মোচন করতে পেরেছিলেন শিশু-মনস্তত্ত্ব। (নাগরী ১৯৮৮: ভূমিকাংশ কুড়ি)

পাখির বাসা কাব্যটি ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হলেও ভাষা আন্দোলনপূর্ব ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর চেতনা এখানে ক্রিয়াশীল ছিল। আবার পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশ বেতারে

যে কিশোরদের শিক্ষামূলক কিশোর মজলিস পরিচালিত হত সেখানে ফররুখ আহমদ সম্পৃক্ত ছিলেন। যার কারণে কিশোরদের শিক্ষামূলক কাব্য রচনার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। তাঁর *পাখির বাসা* ছড়াকাব্যটি সহজাত শিশুর আনন্দ সঞ্চারের চেয়ে এদেশের প্রকৃতি ও পাখি জগতের তথ্য জানার পাঠ্যচিন্তা, নীতিশিক্ষা, ইসলামি ঐতিহ্যের প্রকাশ, ভারতের জাতীয় মুসলিম নেতাদের স্তুতি এবং মুসলমান রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান পুনর্গঠনের চিন্তায় প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য এ কাব্যের শেষাংশ সমকালীন সময়ের যুদ্ধ বিবেচনায় নির্মিত হয়েছিল।

এ কাব্যে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ইসলামি চৈতন্য নির্মাণের এক শিক্ষক, শিশুর দেশাত্মবোধ সঞ্চারকারী কবি এবং মধ্যযুগের মুসলিম ঐতিহ্যনির্ভর এক ছড়াশিল্পী। পরিশেষে হয়ে উঠেছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় একজন কর্মী। ফলে ছড়ার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলেও তিনি চেয়েছিলেন তাঁর আদর্শ আগামী প্রজন্মের কাছে সঞ্চারিত করতে।

পাখির বাসা ফররুখ আহমদের একটি মননশীল ছড়াকাব্য যা সাতটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ *পাখির বাসা* যেখানে বিভিন্ন প্রকার পাখির বাসা নিয়ে তিনি ছড়া রচনা করেছেন। দ্বিতীয় অংশ *মজার ব্যাপার* যেখানে হাস্যরস আর আঙ্গিক গঠনে অভিনবত্ব থাকলেও সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে উপদেশ বা নীতিশিক্ষামূলক ভাবনা। তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ *পাখ্-পাখলি* ও *পাঁচ-মিশেলী*। এখানে বাংলার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দৃশ্য এসেছে। যার প্রথমাংশে পাখির সৌন্দর্য আর দ্বিতীয়াংশে ষড়ঋতুর সৌন্দর্য চোখে পড়ে। *রূপ-কাহিনী* অংশে বহুল প্রচলিত ইরানি রূপকথার প্রকাশ। *সিতারা ও শাহীন* অংশে উপমহাদেশের মুসলিম নেতা বা তাদের স্তুতিবন্দনা। আর শেষাংশে *চলার গান* যেখানে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে আদর্শ মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছেন কবি ছড়াকার ফররুখ আহমদ। ধারণা করা হয় ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে স্বজাতিকে উদ্দীপ্ত করতে উদ্দেশ্যমূলক রচনা। অবশ্য সামগ্রিক *পাখির বাসা* ছড়াকাব্য নিয়ে ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

> শিশুদের জন্য রচিত এই বইটির বৈশিষ্ট্য এই যে, ফররুখ 'ছেলে ঘুমানো' ছড়া কেটে, গল্প বলে তাদের মুখে-চোখে খুশীর হাসি ফুটিয়ে তোলার কাজটি মুখ্য করে তোলেন নি। শিশু মনোরঞ্জনের চেয়ে শিশুকে তার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও জীবজগত সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞানদান করার, ধর্ম, জাতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শে দীক্ষাদান করার এবং স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই যে কবি এ শিশু-তোষ কাব্যটি রচনা করেছেন, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। (মুখোপাধ্যায় ২০১৪: ১৯০)

পাখির বাসা অংশের ছড়াগুলোর মাঝে কবি ফররুখ আহমদ বেশ কয়েকটি পাখির বাসা এবং তাদের জীবনাচার প্রকাশ করেছেন। এখানে প্রত্যেকটা পাখির বাসা যে ভিন্ন ভিন্ন গঠনের এবং পাখির জীবনাচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত তা তিনি সহজ সরল আর ছান্দসিক উপস্থাপনের মাধ্যমে শিশুর মনোজাগতিক শিক্ষকে পরিণত হয়েছেন:

শুক্‌নো কুটোর রাশ নিয়ে
ওড়ে বনের পাশ দিয়ে
হয়তো নামে একটু সে
উলুখড়ের ঐ চালে ॥ (আহমদ ১৯৬৫: ৫)

এ ছড়ায় ঘুঘু পাখির বাসার নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন। শুকনো খড়কুটোর কিংবা উলুখড়ের দ্বারা ঘুঘু তার বাসা নির্মাণ করে। একধরনের শিক্ষণীয় বিষয় এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। তবে ছড়াকে শিশুর সরল আনন্দের মাঝে মনোবিকাশের চিন্তাটাকে মুখ্য করে তুলেছেন ছড়াকার ফররুখ আহমদ। অবশ্য পাখির মধ্যে যে এক শিল্পিত বাসা নির্মাণের কৌশল আছে, তা শিশুর মাঝে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন:

বাবুই পাখী শিল্পী বড়
পাতার সূতো করে জড়,
মগজে তার খেলে যখন
কল্পনা রংগিন ॥ (আহমদ ১৯৬৫: ৯)

পাখির মাঝে যে শিল্পিত সত্তা আছে তার সন্ধান দিয়েছেন। বাবুই পাখির দীনতা আছে, তবে সে পরাধীন নয়, নিজের ঠোঁটে নিপুণভাবে বয়ন করে আপন ঘর। সেই বুননের কৌশল দিয়ে বাবুই কল্পনার মত রঙিন করে নির্মাণ করে তার বাসাকে। প্রকাশিত হয়েছে পাখির শৈল্পিক বাসা, কোটরে বা মাটির মাঝে নিরাপদ পাখির বাসা। অর্থাৎ পাখির খাবার ও তার বসবাসের অনুকূলে নিরাপদ স্থানে সে বাসা নির্মাণ করে। এ অংশে বক, প্যাঁচা, গাঙ শালিক এবং চড়ুই পাখির আপন আপন বাসা নির্মাণকৌশল এবং তাদের নিজস্ব জীবনযাপনে তাদের বাসা যে একটা বড় জায়গা করে রেখেছে তাই যেন শিশুদের শিক্ষা দিয়েছেন।

এ ছড়াগ্রন্থের পরের অংশ *মজার ব্যাপার*। এ অংশের প্রাথমিক দিকে যে ছড়াগুলো আছে সেখানে রয়েছে নিছক ছড়ার আনন্দ সঞ্চারের অভিপ্রায়। যা লোকছড়ার অনুরণনে নির্মিত। রয়েছে উদ্দেশ্যহীন শিশু ভোলানোর সহজ আনন্দ। কিন্তু পরবর্তী ছড়াগুলোর ভিতরে রয়েছে শিশুর আনন্দ দানের আড়ালে নীতিশিক্ষা। বিশেষ করে *বাদুড়ের কীর্তি*, *দাদুর কিস্‌সা*, *বিশেষ অনুরোধ* ইত্যাদি ছড়ার মাঝে ছড়াকার ফররুখ আহমদ শিশুর মনোজাগতিক চৈতন্যে নীতিশিক্ষা সঞ্চারিত করেছেন। ফররুখ আহমদ প্রকৃতই চেয়েছিলেন সাতচল্লিশ পরবর্তী পাকিস্তানের নতুন প্রজন্ম প্রকৃতির আলো-বাতাসের সঙ্গে নীতিনিয়ম শাসিত মানুষ হিসেবে বড় হয়ে উঠুক। আর তারই অনুকূল চিন্তা নিয়ে তিনি *পাখ্-পাখালি* অংশেও পাখিদের বৈচিত্র্যময় জগৎ উপস্থাপন করেছেন। তবে এখানে আর শুধু বাসা নয়, এদেশের প্রকৃতির অংশ হিসেবে পাখির সৌন্দর্য এবং তাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করেছেন:

পাখ্-পাখালির গান শুনিগে চল;
ঝর্না ধারার মত পাখীর

শব্দ কলকল ॥
কোন বনে ভাই উড়ছে ওরা
শব্দ শুনে বৃথায় ঘোরা
লুকিয়ে কোথায় গাছের ডালে
পাখীরা চঞ্চল ॥ (আহমদ ১৯৬৫: ৩৩)

এ ছড়া অংশের মাঝে, পাখিদের গান, তাদের রূপ-সৌন্দর্য, তাদের আচার-আচরণ; পাখিদের প্রতি কবির ভালোবাসা, ভালোলাগা প্রকাশ করেছেন আবেগহীনভাবে। যদিও কোথাও কোথাও ছড়ার সহজ সৌন্দর্য থেকে সরে গিয়ে কেবল পাঠ্য নির্মাণের চিন্তা মুখ্য হয়ে উঠেছে। পাখির সঙ্গে মিশে যাবার আনন্দ, তাদের বাধাহীন গান, জলের মাঝে ঝাঁপ দিয়ে মাছ ধরা, দূর দেশ থেকে শীতে অতিথি হয়ে আসা, কাঠঠোকরার ঠোঁটের শক্তি আর টিয়ার ঠোঁটের সৌন্দর্য সব মিলিয়ে শিশুদের যেন এক স্বপ্নপুরীর ভাবকল্পনার জগৎ নির্মাণ করে দেয়। আমাদের নদী-নালা, বিল-বাওড়ে যে শীতের পাখির আগমন ঘটে ফররুখ আহমদই এই সকল পরিযায়ী পাখিদের বিষয়ে এবং তাদের সৌন্দর্যের দিকটি ছড়ার মাধ্যমে শিশুদের কাছে তুলে ধরেছেন।

প্রাচীন কাল থেকেই এ দেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। ঋতুবৈচিত্র্যের কারণে ছয় রকম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে এদেশের মানুষের পরিচয় ঘটে। এদেশের শিশুর কাছে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং তার রূপ-বৈচিত্র্যের নানা দৃশ্য এ পর্বের ছড়া *পাঁচ-মিশেলী* অংশে প্রকাশ করেছেন। বৈশাখের ঝড়, বর্ষার বৃষ্টি, মেঘলা আকাশ, বিজলির ঝলক এক অপূর্ব দৃশ্যকল্প সৃষ্টি করেছে:

সারা আকাশ ছলছলিয়ে
বিজ্‌লি আলো ঝলমলিয়ে
বৃষ্টি নামে অনেক দূরে
মেঘের পাড়াতে ॥
মেঘেরা সব বিনি সুতোর ঘুড়ি,
এ দেশ থেকে ও দেশ পানে চলে গো উড়ি॥
চলার পথে যায় ঝরিয়ে
মেঠো নদী যায় ভরিয়ে,
ঝিমজিমিয়ে ঝিমঝিমিয়ে
কোথায় হারাতে ॥ (আহমদ ১৯৬৫: ৪৫)

এছাড়াও *শরতের গান*, *শীতের গান*, *ফাল্গুনের গান* এবং *চৈত্রের গান* ছড়ার মাঝে এদেশের ষড়ঋতুকে জানার, বোঝার উপযোগী করে শিশুদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

রূপ-কাহিনী'তে দুটি ছড়া-কবিতা রয়েছে যা একই কাহিনীর উপর নির্মিত। বহুল প্রচলিত ইরানি রূপকথা। এক দানবের হাতে বন্দি রাজকন্যা। দানবের প্রাণ কোন এক কোটরে প্রাণ ভোমরার মাঝে লুকিয়ে রাখা। শাহজাদা পঙ্খীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এসে সোনারকাঠি-রূপারকাঠি ছুঁয়ে শাহজাদীর ঘুম ভাঙিয়ে, রূপকথার দানবকে হত্যা করে

শাহজাদীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সেই কাহিনীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে *রূপ-কাহিনী* অংশ। এখানে শিশুকে রূপকথার গল্প বলাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। যদিও তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু পৌরাণিক আখ্যানের বাইরে এসে শিশুদের আনন্দের উপকরণ হিসেবে ভিন্ন ধারাকে প্রতিষ্ঠা করতে। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত গল্পের মাঝে ভিন্ন স্বাদ নির্মাণ করেছিলেন।

এ ছড়াকাব্যকে যদি দুইটা ভাগে বিভাজন করা হয় তবে এ অংশ পর্যন্ত যে ছড়া রচিত হয়েছে তাকে নির্মোহ শিশু আখ্যান বলা যেতে পারে। যেখানে শিশুর মনোজাগতিক বিকাশই কবির মূল লক্ষ্য। গ্রাম বাংলার খুব পরিচিত প্রকৃতিই তার এ অংশগুলোতে বার বার উঠে এসেছে। *পাখির বাসায়* এর পরবর্তী ছড়াগুলোর অস্থি-মজ্জায় একটা রাজনৈতিক আখ্যান লুকিয়ে আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বাইরে গিয়ে ইসলামি পুনর্জাগরণের এই কবি যে পাকিস্তান আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর ছড়াকে সচেতনভাবে ইসলামিকরণের চেষ্টা করেছিলেন। ফররুখ আহমদের চিন্তায় বিকশিত হয়েছিল যে পাকিস্তান রাষ্ট্র হবে সামগ্রিক ইসলাম জাহানের ঝাণ্ডাধারী। আর ইসলামের আগামী প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করবে এই রাষ্ট্রটি। পরবর্তী কালে যদিও এই ধারণা থেকে তিনি সরে এসেছিলেন।

'সিতারা ও শাহিন' অংশে রয়েছে একটু ভিন্নধারার ছড়া। *সিতারা* ও *শাহিন* এই দুই নামের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। *সিতারা* অর্থ নক্ষত্র। যে আলো বা সিতারা নাবিককে গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারে। সমগ্র মুসলিম জাহানের গন্তব্যের দিশারী। আর *শাহিন* অর্থ বাজপাখি বা শিকারী পাখি। যার ক্ষিপ্রগতির জন্য লক্ষ্যভেদ করতে পারে সহজে। পাখার ঝাঁপটায় ঝড় সৃষ্টি হয়। আর সেকারণেই *সিতারা ও শাহিন* মুসলিম জাহানের অগ্রযাত্রার ইঙ্গিত বহন করে। কবি ফররুখ আহমদ এই অংশে নব সম্ভাবনার কথা বারবার প্রকাশ করেছেন। নতুন জাহান সৃষ্টি, নতুন আশার সঞ্চার, নতুন আলোর আশা, সম্মুখে সমৃদ্ধির আহ্বান, আকুতি এ অংশে প্রকাশিত হয়েছে:

সকলের ভালোবাসায়
জাগে ফের নতুন আশার
দুনিয়া জাহান সারা।
সিতারার মাহফিলে ভাই
সে আলোর গান গেয়ে যাই
নিতে সে আলোর ধারা ॥ (আহমদ ১৯৬৫: ৬১)

এমন এক ভালোবাসার নতুন আশার দুনিয়া জাহান চেয়েছেন যার পথ দেখাবে সিতারা। যে জাহান হবে নব মুসলিম জাহান। দুর্দিন কাটিয়ে সৃষ্টি হবে নব আলোর দুনিয়া। সমগ্র মুসলমান আবারও আদর্শের অনুসারী হবে, "...চল সম্মুখে/ ভয় হারা বুকে..." (আহমদ ১৯৬৫: ৬৩)। আর তারই উদ্দেশ্যে দুর্জয়, দুরন্ত গতিতে সামনে

যাওয়ার আহ্বান প্রকাশিত হয়েছে। *রংমহল* বা *সাম্পান* ছড়া-কবিতার মধ্যে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়:

১. অচিন সাগর পাড়ি দিয়ে যাই শেষে
ভোর না হওয়ার আগে অচিন দূর দেশে,
নামিয়ে সোয়ার মাটির বুকে
আবার উড়ে যাই সম্মুখে
নতুন দিনের সুরুয পথে চায় হেসে ॥ (আহমদ ১৯৬৫: ৬৫)

২. নতুন দিনের কিশ্‌তী আবার যায় ছুটে
অতীত রাতের ভুল যা ছিল যায় টুটে
চলার পথে সাম্পানের
নতুন সাগর জাগলো ফের;
নতুন প্রাণে খুশীর জোয়ার যায় লুটে ॥ (আহমদ ১৯৬৫: ৬৭)

'রংমহল' কবিতাটিও ইরানি কিংবদন্তী ও রূপকথার মিশ্রণে গড়ে ওঠা এক আলো আঁধারি কাহিনী। হাতেমের সাহসী ঘটনা এখানে প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্বের ছড়াগুলোর মাঝে একটা প্রতীকী ভাবনা যুক্ত হয়ে আছে। শব্দগুলোর মধ্যে যে পৃথিবীর আকুতি লুকিয়ে আছে তা একান্ত কবির স্বপ্নে লালিত মুসলিম জাহান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মুসলিম খেলাফতের পতনের পর নতুন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান কবির মনে আবার নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। মনের গভীরে স্বপ্ন দেখেছিলেন, পাকিস্তান সেই মুসলমানদের পুরনো গৌরব ফিরিয়ে আনবে। আর সেই স্বপ্নই বিকশিত হয়েছে এই ছড়া কবিতায়। অবশ্য *জঙ্গীপীর*, *তিতুমীর* আর *মহান নেতা* এই তিনটি ছড়ার মধ্যে উপমহাদেশের তিনজন মহাত্মা মুসলমান প্রতিনিধির কথা তুলে ধরেছেন। যথা মুসলিম সমাজ সংস্কারক রায়বেরিলীর সৈয়দ আহমদ, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা তিতুমির এবং দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ:

স্বাধীন জাতির মহান নেতা
মৃত্যুহীন প্রাণ,
তোমার স্মৃতির মিনার দেখি
আজাদ পাকিস্তান। (আহমদ ১৯৬৫: ৭৪)

বিভাগোত্তর রাজনৈতিক ছড়াচর্চায় ফররুখ আহমদের মত এতখানি সরাসরি উপস্থাপন আর কেউই করেননি। তাঁর *চলার গান* অংশের ছড়াগুলোতে সমকালীন রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রভাব এখানে বিপুল পরিমাণে সঞ্চারিত হয়েছে। মূলত ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র এতদিনের বঞ্চিত মুসলমানরা নিজেদের বড় প্রাপ্তি হিসেবে দেখেছিল। ফলে দেশ ভাগের কষ্ট তাদের তাড়িত করেনি। বরং রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের পুনর্গঠনের চিন্তা মুসলমানদের ভিতরে প্রবলভাবে জেঁকে বসেছিল।

অন্যদিকে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় কবির ধর্মীয় চেতনা এবং স্বাজাত্যপ্রীতি বৃদ্ধি পায়। তারই প্রভাবজাত সাহিত্যকর্ম *চলার গান* অংশটি। একারণে এই অংশটি এ কাব্যের

অন্যান্য অংশ থেকে বিষয় ও উপস্থাপনায় ভিন্ন। শিশুতোষ রচনা হলেও এখানে যে ভঙ্গিমায় রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তাতে আর অতখানি শিশুতোষ থাকেনি। বরং যুদ্ধের উদ্দীপনামূলক গান হিসেবে রচিত হয়েছে। তাই সহজেই বলা যায় অন্যান্য অংশের মত *চলার গান* কবির সহজাত শিল্পকর্ম নয়; বরং উদ্দেশ্যমূলক রচনা।

শিশুদের মাঝে তিনি ধর্ম, ইসলামি ঐতিহ্য, দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদ সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। আগামী দিনে ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান যেন সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে সেই বোধ শিশুদের মধ্যে প্রদান করাই ছিল ফররুখ আহমদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ আগামী দিনের শিশুরাই আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে গড়ে তুলবে:

আমরা গড়ব পাকিস্তান,
আমরা পরব জ্বেহাদী সাজ,
দুনিয়া জাহানে আনব ফের
আখেরী নবীর নয়া হেজাজ ॥ (আহমদ ১৯৬৫: ৮০)

ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান পুনর্গঠনের তাগিদ এখানে বিকশিত হয়েছে। দেশ গঠনের জন্য শিশুদের জেহাদি হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সংগ্রাম আর পবিত্রতার মধ্য দিয়েই আসবে আগামীর পরিশুদ্ধ পাকিস্তান। এ অংশের প্রথম ছড়া *ঈমান একতা শৃঙ্খলা* মূলত ধর্মীয় বোধের ছড়া। শিশুদের আত্মশুদ্ধির জন্য ঈমান, আত্মশক্তির জন্য একতা আর আত্মগঠনের জন্য শৃঙ্খলা প্রয়োজন। এই তিনটির মধ্য দিয়ে আগামী দিনের শিশুরা হয়ে উঠবে পরিপূর্ণ বিকশিত মানুষ। *আজাদ পাকিস্তান*—সংগ্রামী আর বীর মুজাহিদদের রক্তের বিনিময়ে প্রাপ্ত স্বাধীন পাকিস্তানকে খোদার এক দান বলে উল্লেখ করেছেন:

বীর মুজাহিদ আন্‌লো যারে
তপ্ত বুকের রক্ত ধারে
লাখো শহীদ প্রাণ দিয়ে ভাই
পেলো খোদার দান ॥ (আহমদ ১৯৬৫: ৭৯)

এ ছড়ায় প্রকাশ করেছেন—চাঁদ তারার নিশান যেন পাকিস্তানের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের প্রতীক। অবশ্য *আমাদের সবুজ নিশান* নামে আরো একটি ছড়ায় পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার গুণগান করেছেন:

আজাদীর এই দিনে তাই
নিশানের গান গেয়ে যাই,
গেয়ে যাই সাম্য-প্রেমের;
সত্য-ন্যায়ের বজ্র বিধান ॥ (আহমদ ১৯৬৫: ৮১)

এই ছড়াটি পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কবি ফররুখ আহমদ রচনা করেছেন। সাম্য-প্রেম-সত্য-ন্যায় এই চার স্তম্ভের প্রতীক হয়ে উঠুক পাকিস্তানের

জাতীয় পতাকা। অবশ্য শেষদিকের ছড়ায় তিনি ধর্ম এবং ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ গঠনের দিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। যদি মুসলমানরা নিজেদের আদর্শে পুনর্গঠিত হয়, তবে আবার আলোর নদী ফিরে আসবে:

তোরা—নিজের পায়ে দাঁড়াস্ যদি
বইবে আবার আলোর নদী
এই দুনিয়ার গুলশানে ফের
জাগ্‌বে নতুন সাড়া ॥ (আহমদ ১৯৬৫: ৮৩)

আর তারই আহ্বানে ছুটে চলার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান পুনর্গঠনের স্বপ্ন সমাপ্ত হয়েছে। কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধের জন্য পাকিস্তানি সৈন্যদের মানসিকভাবে তাড়িত করতে কবি ফররুখ আহমদ নতুন আশার জন্য সম্মুখে ছুটে চলার আহ্বান জানিয়েছেন:

তোরা—চলবে ছুটে, চলরে সবার সম্মুখে
নতুন আশার সুর মুখে ॥ (আহমদ ১৯৬৫: ৮৪)

কবি প্রত্যাশা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতের আশা নতুন শিশুর মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হোক। মোটকথা এখানে শিশুরা স্বধর্ম, স্বজাতি আর স্বদেশের প্রতি আনুগত্য রেখে এগিয়ে যাক। প্রকৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য আর জাতীয়তাবাদ নিয়ে এদেশের শিশুরা সামনের দিকে অগ্রসর হোক এ কাব্যের এই যেন সার কথা হয়ে উঠেছে।

পাখির বাসা শিশুর অনাবিল ছড়া-আশ্রিত আনন্দ নয়, শিক্ষাদানের উপকরণ মাত্র। সহজ, সরল, অনাবিল আনন্দ বা শিশু ভোলানোর উপকরণ এখানে মেলে না। কখনোই শিশুর আনন্দ লোকে প্রবেশ করতে পারে নি। নীতি আদর্শ শাসিত শিশুর আত্মগঠনের শিক্ষা দিয়েছে। যেখানে দেশ, জাতি, ধর্ম এবং দেশের নির্মোহ প্রকৃতি সম্পর্কে রয়েছে অন্তরঙ্গ পাঠ। এখানে আত্ম অন্বেষণের আনন্দ নেই আছে আত্ম উপলব্ধি নির্মাণে সচেতন জ্ঞানদানের প্রয়াস।

তবে *পাখির বাসা* অংশের ছড়াগুলো সংক্ষিপ্ত, সরল এবং এর রয়েছে পাখিদের বাসা নির্মাণের কৌশলগত জ্ঞান। ছন্দে আর অন্ত্যানুপ্রাসের যথাযথ ব্যবহার থাকলেও আঙ্গিকগত কোনো বিশেষ বয়নকৌশল চোখে পড়ে না। তবে *মজার ব্যাপার* অংশটি ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। মূলত *মজার কোরাস* এবং *মেলায় যাওয়ার ফ্যাকড়া* ছড়াদুটি সমগ্র ছড়াগ্রন্থের মধ্যে পৃথক সৃষ্টি। এখানে শিশুর সহজ আনন্দই মুখ্য হয়ে উঠেছে। নিপুণ ছন্দের ব্যবহার কোথাও কোথাও অনুপ্রাসের চমৎকারিত্ব মুগ্ধ করে এবং একই সঙ্গে শিক্ষাদানের উপকরণ এখানে অনুপস্থিত:

লম্ফ দান
ঝম্প দান,
ঝম্প দিয়ে
লম্ফ দান।
খাট্টা মেজাজ

গরম করে
বিষম ভয়ে
কম্পমান! (আহমদ ১৯৬৫: ১৫)

এই ছড়ার টুকরো টুকরো খণ্ডচিত্রগুলোতে ছড়ার সহজাত বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। তবে কিছু অংশ এখানে যথার্থ ছড়া হয়ে ওঠেনি। স্বরবৃত্ত ছন্দের সহজাত দোল কোথাও কোথাও লক্ষ করা যায় না। এগুলোকে অন্তর্মিল নির্ভর ছড়াধর্মী কবিতা কিংবা গদ্যছড়া বললে ভুল হবে না:

> 'পাখির বাসা'র ছড়াগুলোতে পদ্যছড়ার আদল প্রধান্য লাভ করেছে। অগ্রগণ্য হয়েছে বিষয় ভিত্তিক বর্ণনা। তবু সার্বিক অর্থে বিচার-বিবেচনায় একজন ছড়াশিল্পী হিসেবে ফররুখ আহমদের ভূমিকা বাংলা ছড়া সাহিত্যকে যে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। (বাবুল ১৯৯৫: ১৮-১৯)

'নরম গরম আলাপ', 'বাদুড়ের কীর্ত্তি' এবং 'দাদুর কিস্‌সা' এই ছড়া তিনটির মধ্যে একধরনের ছড়ার নাট্যরূপ নির্মাণের প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে। বিষয়গত ভাবনাতে নীতিশিক্ষা এর উদ্দেশ্য হলেও আঙ্গিক ভাবনায় বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক ছড়াচর্চায় অভিনবত্ব এসেছে। *নরম গরম আলাপ* এবং *দাদুর কিস্‌সা* দুটি দুই চরিত্রকেন্দ্রিক সংলাপ নির্ভর ছড়া হয়ে উঠলেও *বাদুড়ের কীর্ত্তি* যথার্থ একাঙ্কিকা হিসেবে মূল্যায়ন করা চলে। ছড়ানাট্যটি বহুল প্রচলিত লোককাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠলেও প্লট, চরিত্রের বিকাশ, সংলাপ, আখ্যানের নাটকীয়তা এবং মঞ্চায়ন যথার্থই উপস্থাপন করেছেন ছড়াকার:

বাঘ।। দাও তাড়িয়ে, দাও তাড়িয়ে
সব চালাকি দাও ছাড়িয়ে,
দু' মুখো ওই বাদুড়গুলো
দরকারে দেয় চোখে ধূলো
হরহামেশা সুযোগ খোঁজে।

ভাল্লুক।। বর্ণচোরা, ধাপ্পাবাজ
ওদের দিয়ে হয় না কাজ
ওরা কেবল স্বার্থ বোঝে। (আহমদ ১৯৬৫: ২৫-২৬)

তিনটি দৃশ্যে বিন্যাস্ত হয়েছে এর কাহিনী। পশুপাখির মুখে ভাষা দিয়ে উপকথাধর্মী রচনা নির্মাণ করেছেন। সবশেষে সমবেত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করেছে ছড়ানাট্যটি। ফররুখ আহমদ অন্যান্য রচনায় *কিস্‌সা* থাকলেও এখানে দাদুর কিস্‌সা লক্ষ করা যায়।

পাখ্-পাখালি ও *পাচঁ-মিশেলী* অংশ দুটি আঙ্গিকের ক্ষেত্রে *পাখির বাসা* অংশের অনুগামী। তবে কোথাও কোথাও স্বরবৃত্তের আরো পরিণত ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এ কাব্যে অনেকাংশে লোকজচিত্র কিংবা লোকজ শব্দের ব্যবহার চোখে পড়ে– *উড়কি*

ধানের মুড়ি, *মিষ্টি কুটুম*, *উলুখড়ের চাল*, *ঘুড্ডি লাটাই*, *সাম্পান*, ইত্যাদি। অবশ্য শব্দের আঞ্চলিক ব্যবহারও লক্ষ করা যায়—তবে তা নেহাতই স্বল্প পরিমাণে—*সোয়াদ* (স্বাদ), *সুরুয* (সূর্য), *পগার পার*, *ফ্যাকড়া*, *খাট্টা মেজাজ* ইত্যাদি।

তাঁর *রূপ-কাহিনীর শাহজাদা* ও *শাহাজাদী* এবং *রংমহল* ছড়াগুলি রূপকথাধর্মী রচনা। দেও, দৈত্য, সোনারকাঠি, রূপারকাঠি, প্রাণ ভ্রমর, আলো আঁধারি রাজ প্রাসাদ, জাদুর দুয়ার ইত্যাদি রূপকথার উপকরণ রয়েছে। এখানে রূপকথার আবহ এবং আদর্শ দুটোই গ্রহণ করা হয়েছে।

এ ছড়াগ্রন্থের *রূপ-কাহিনী*, *সিতারা* ও *শাহীন* এবং *চলার গান* অংশে আরবি-ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ইসলামি আবহ নির্মাণের জন্য; শিশুদের মধ্যে সচেতনভাবে আরবি-ফারসি শব্দ সঞ্চারিত করা এবং মধ্যযুগের মুসলিম সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসারী হয়ে এ কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন:

> দুনিয়া জাহানে আনবো ফের
> আখেরী নবীর নয়া হেজাজ॥ (আহমদ ১৯৬৫: ৮০)

পাকিস্তানের সাহিত্য হবে ফারসি ঐতিহ্য অনুসারী আর তা ধর্মে হবে আবরি ঐতিহ্য অনুসারী। এই ভাবধারাকে সমন্বিত রাখতে গিয়ে এই অংশগুলোতে তিনি অধিক আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে অযাচিত অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারের জন্য তাকে সমালোচিতও হতে হয়েছে। সমালোচক সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে:

> ইসলামি পরিবেশ সৃষ্টির দোহাই দিয়েও শিশুর জন্য রচিত কবিতায় আজদাহা, সফেদ, পরেন্দা, সিয়া, দ্বীনী হুকুমাৎ, মুজাদ্দিদ, ওয়াতান, দারাজ, ইত্যাদি দুস্পাচ্য শব্দ ব্যবহারের কোন সার্থকতা আছে বলে মনে করি না। (মুখোপাধ্যায় ২০১৪: ১৯৬)

কোনো কোনো ছড়ার ভাব ও অভিব্যক্তির কারণেই ছড়ায় বিধৃত আরবি-ফারসি শব্দকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। তবে অধিকাংশ ছড়াতেই এ-জাতীয় শব্দকে আরোপিত বা পরিকল্পিত মনে হয়। এ সম্পর্কে কবির মত প্রকাশিত হয়েছে একজন সমালোচকের লেখায়:

> তিনি বলতেন, ৫০০ বছর ধরে বাংলা ভাষা উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। এই ভাষা আরবি, ফারসী, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজী সব ভাষা থেকে শব্দ সঞ্চয় করে সমৃদ্ধ হয়েছে। এই পটভূমিতে তিনি প্রচুর আরবি ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন... (চৌধুরী ২০০৪: ৭৭)

বাংলা কাব্যে নজরুল পরবর্তী ফররুখ আহমদই আরবি-ফারসি ভাষার শব্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। শুধু ভাষা নিয়েই নয়, আঙ্গিকের অন্যান্য নিরীক্ষাও করেছেন। পরিমিত অলঙ্কারের ব্যবহার এ কাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। অনুপ্রাস, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, যমক, রূপক, ধনাত্মক অব্যয়সহ নানা অলঙ্কারের ব্যবহার চোখে পড়ে।

চলার গান অংশের ছড়াগুলোর মাঝে গীতিধর্মিতা লক্ষ করা যায়। গানের আঙ্গিকে নির্মিত হয়েছে ছড়া। একজন বেতার কর্মী হিসেবে যুদ্ধের উৎসাহব্যঞ্জক গান রচনা করেছিলেন। যা অনেকাংশে ছড়াধর্মী। অর্থাৎ এ কাব্যে রূপকথা, উপকথা, ছড়ানাট্য, ছড়াধর্মী গান, আখ্যান বা কিচ্ছানির্ভর ছড়ার সন্ধান মেলে যা আঙ্গিক বিবেচনায় সমগ্র বাংলা ছড়াসাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি।

দীর্ঘ দিনের ব্রিটিশদের *ভাগ কর শাসন কর নীতি* ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্কে ক্রমশ চির ধরেছিল। ছেচল্লিশের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যেন হিন্দু ও মুসলমানদের একধরনের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে রাষ্ট্র পুনর্গঠনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এ সময় পাকিস্তানের সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ধর্মচিন্তাও বৃদ্ধি পায়। একারণেই পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে পাকিস্তান আন্দোলন আরো প্রবল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু ক্ষমতালোভী নেতা চেয়েছিলেন পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের এই ধর্মীয় অনুভূতিকেই পুঁজি করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় কাশ্মীর বিবেচনায় পাকিস্তানের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়; তার প্রভাব *পাখির বাসার* শেষাংশে লক্ষ করা যায়। ফররুখ আহমদ পূর্ব থেকেই ইসলামি পুনর্জাগরণের কবি হিসেবে বাংলা সাহিত্যে পরিচিত। ভাষা আন্দোলনের পক্ষে দৃঢ় সমর্থন দান করে চাকরি সংকটে পতিত হলেও বিভাগোত্তর সময় থেকে দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তান আন্দোলনের প্রভাব তাঁর ছড়া-কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। যদিও দৃঢ় ধর্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ফররুখ আহমদ ক্ষমতা, অর্থ এবং সাম্প্রদায়িক চিন্তা থেকে সর্বদা মুক্ত ছিলেন।

তথ্যসূত্র

আহমদ, ফররুখ (১৯৬৫)। *পাখির বাসা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

চৌধুরী, শামসুল হুদা (২০০৪)। 'আপোষহীন ফররুখ', *ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি* (সম্পাদক- বাবুল, রুহুল আমিন (১৯৯৫)। *ছড়ায় বাংলাদেশ*। মল্লিক ব্রাদার্স, কোলকাতা।

নাগরী, শাহাবুদ্দীন (১৯৮৮)। *বাংলাদেশের ছড়া* (সম্পাদক- আব্দুল মান্নান সৈয়দ, আবিদ আজাদ ও শাহাবুদ্দীন নাগরী)। শিল্পতরু প্রকাশনা, ঢাকা।

মুখোপাধ্যায়, সুনীল কুমার (২০১৪)। *কবি ফররুখ আহমদ*। নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা।